অরণ্যমন ঃ বুদ্ধদেব গুহ

মীনাক্ষী সিংহ

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

এই বইয়ের ভূমিকা আমি নিজে না লিখলেই ভালো হতো কিন্তু আমাকেই যখন লিখতে বলা হয়েছে তখন নিরুপায়।

এ পর্যন্ত 'সাহিত্যম্' থেকে প্রকাশিত কমল চৌধুরীর 'অয়ন' (হলুদ বসন্ত থেকে চাপরাশ) ছাড়া আমার সাহিত্যকর্ম নিয়ে কোনো বইই প্রকাশিত হয়নি। হয়তো আমার দ্বারা সাহিত্যকর্ম তেমন হয়ওনি বলেও।

মীনাক্ষী দেবীর অরণ্যমন আমার কয়েকটি বই, 'হলুদ বসন্ত', 'কোয়েলের কাছে', 'একটু উষ্ণতার জন্যে', 'কোজাগর', 'দূরের ভোর', 'মাধুকরী', 'চাপরাশ', 'সম', 'চবুতরা' এবং 'রাগমালা' সম্বন্ধে উনি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন এবং নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। উনি নিজে বাংলার অধ্যাপিকা ছিলেন তাই তাঁর লেখাতে পাণ্ডিত্যের ছাপ আছে। আমার মতো অর্ধশিক্ষিত মানুষের পক্ষে পণ্ডিতজনের প্রশংসা অবশ্যই অত্যন্ত মূল্যবান।

উনি আমার লেখার বিশেষই ভক্ত। বছর পঁচিশেক আগে ওঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ হবার পরেই সে কথা বুঝি। ভক্ত বলেই আমার লেখার সবই ভালো এমন মতই ব্যক্ত করেছেন এই প্রবন্ধমালাতে—যা অনেক পাঠকের পছন্দ নাও হতে পারে। আমি নিজেও বিশ্বাস করিনা যে আমার লেখা শুধু প্রশংসারই যোগ্য। কিন্তু একজন ভক্ত পাঠিকার অনাবিল হৃদয়ের নৈবেদ্য যে-কোনো লেখককেই খুশি করে। সে কারণে আমি স্বভাবতই খুশি হয়েছি। তবে যাঁরা এই বই পড়বেন তাঁরা-ই বিচার করবেন এতখানি প্রশংসা পাওয়ার যোগ্যতা লেখকের আদৌ ছিল কী না!

বিনত

বুদ্ধদেব গুহ

পয়লা জানুয়ারি, ২০০৮

'অরণ্যমন ঃ বুদ্ধদেব গুহ' প্রকাশিত হ'ল।

বুদ্ধদেব গুহর সাহিত্যকৃতির সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ণের প্রয়াসে এই গ্রন্থ রচনা। মনে মনে পরিকল্পনা ছিল দীর্ঘদিন, তবু অনেক দেরী হ'য়ে গেল—সে ত্রুটি ও দায় আমারই।

এ বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন বুদ্ধদেব গুহ স্বয়ং। আরণ্যক প্রচ্ছদটিও তাঁর আঁকা—এ বইয়ের গৌরব ও মর্যাদা সেখানেই। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ 'পুনশ্চ' প্রকাশনীর শ্রী সন্দীপ নায়ককে। তাঁর উদ্যোগ ও সহযোগিতা ছাড়া এ বই প্রকাশিত হ'ত না। সেই সঙ্গে শ্রী সপ্তর্ষি নায়ক ও 'পুনশ্চ'র সকল সহযোগী কর্মীকেও আমার ধন্যবাদ জানাই।

'অরণ্যমন ঃ বুদ্ধদেব গুহ' তাঁর অনুরাগী পাঠকদের ভালো লাগলে ধন্য হ'ব।

পয়লা জানুয়ারি, ২০০৮
সল্টলেক, কলকাতা

নীল নির্জন লেখনীতে যাঁর
কথা কয় চুপে চুপে,
অরণ্যমন যাঁর রচনায়
ধরা দেয় শতরূপে।
ভোরের আগে কি সন্ধ্যের পরে
বনবাসরের গানে
দূরের দুপুর ভরে ওঠে যাঁর
লেখনীর সুরে তানে;
বনজ্যোৎস্নায় সবুজ আঁধারে
ভরা প্রকৃতির প্রাণ
যাদু লেখনীতে যিনি শোনালেন
কুর্চিবনের গান—
নীর অরণ্য অনুভবে যাঁর
প্রাণ পায়, পায় ভাষা
তাঁরি রচনায় তাঁকেই জানাই
শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

বুদ্ধদেব গুহ। বাংলা সাহিত্যের এক ঋজু ব্যক্তিত্ব, বহু কৌণিক হীরকের মতোই বিচ্ছুরণ দীপ্ত, রোম্যান্টিক, প্রকৃতি মিষ্টিক এক কবিপ্রাণ—সাহিত্য, সংগীত শিল্প-সর্বোপরি জীবনময়তার অন্য এক নাম।

বিচিত্রমুখী প্রতিভার প্রতিফলনে সমৃদ্ধ বুদ্ধদেব গুহ-র বিশিষ্ট পরিচয় তাঁর প্রকৃতিমগ্ন সত্তা, তাঁর বইয়ের পাতায় নিজস্ব নির্জনে পাঠকের সঙ্গে যাঁর সুগভীর নিবিড় পরিচয় গড়ে ওঠে।

ওঁর সঙ্গে আমরাও যেন কখনো চলে গেছি 'কোয়েলের কাছে', কখনো বা 'নগ্ননির্জনে', 'হলুদ বসন্ত' পাখির ডাক শুনতে কোনো জঙ্গালমহলে। কখনো 'ভোরের আগে', কখনো বা 'সন্ধ্যার পরে' 'বনজ্যোৎস্নায় সবুজ অন্ধকারে', বুদ্ধদেব জাদু লেখনিতেই শুনতে পেয়েছি 'কুর্চিবনের গান'।

প্রকৃতিকে এমন নিবিড় করে, এমন মধুর করে এমন অন্তরঙ্গ আলাপনে তিনি কাছে এনেছেন যে তাঁরই সূত্রে স্রষ্টাকেও মনে হয়েছে অনেকদিনের চেনা। প্রকৃতির সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ মিতালির কারণেই বোধহয় ওঁর চরিত্রে আছে সতেজ ঋজুতা সপ্রাণ বন্ধুতা ও সরস সহৃদয়তা। হয়তো একারণেই তিনি বর্তমান সময়ের তথাকথিত নাগরিক সভ্যতার মেকি আবরণকে ছিন্ন করতে চান—মানুষকে প্রকৃতির বিশালতার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আত্ম আবিষ্কারে সাহায্য করেন।

সাহিত্যে প্রকৃতির এই ব্যাকুল বাঁশরি বেজে চলেছে নিরবধিকাল। প্রকৃতির গান শোনার জন্যে কবিচিত্ত উৎসুক। জয়দেব থেকে বিদ্যাপতি, কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ থেকে জীবনানন্দ—সকলের লেখাতেই প্রকৃতি তার বিচিত্ররূপে বর্ণে গন্ধে এক সজীব অস্তিত্ব রূপে ধরা পড়েছে।

পূর্বসূরীদের প্রকৃতিভাবনার এই উত্তরাধিকার আবার যেন খুঁজে পাওয়া গেল বুদ্ধদেবের লেখনিতে। প্রকৃতিকে তিনি গড়ে নিয়েছেন আপনমনের মাধুরী মিশিয়ে। কখনো তা জলরঙের আলতো ছোঁয়ায় অনন্য, কখনো প্যাস্টেলের গভীরতায় ঘন, কখনো তেলরঙের বৈভবদীপ্ত ক্যানভাস, আবার কখনো এসব কিছুই নয় শুধু কলমের আঁচড়ে লেখা ঋজু স্কেচ মাত্র। এজন্যই আজকাল তাঁর বইয়ে নিজের আঁকা প্রচ্ছদ বা অলংকরণ যেন অনেকটাই তাঁর মনের আয়না

হয়ে ধরা পড়ে, সাহিত্য অন্যতর মাত্রা পায়। বুদ্ধদেবের লেখায় প্রকৃতিকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবা যায় না; উপন্যাসের সমগ্র পটভূমিতে প্রকৃতির বাতাবরণ। জীবনের টুকরো গল্প আর প্রকৃতির টুকরো ছবি দিয়ে গড়ে ওঠা তাঁর রচনা যেন অনবদ্য এক কোলাজ। প্রকৃতির ধ্বনি ঝংকৃত এমন শ্রবণসুন্দর ও হৃদয়মন্দ্রিত এমন শোভনসুন্দর তাঁর সাহিত্যে যে পাঠক সেই গভীর অরণ্যমনে অচিরেই পথ হারায়।

বাল্য কৈশোরে অরণ্যে শিকার করতে গিয়ে তাঁর মধ্যে ঘটেছিল প্রকৃতি চেতনার অস্ফুট উন্মেষ। তখন কে জানতো সেই মৃগয়া নামক খেলাচ্ছলেই বনভূমি তাঁর মনোভূমিতে রূপান্তরিত হবে। ধীরে ধীরে অরণ্যপ্রকৃতি লেখকের কাছে প্রিয়তর হল, স্বাদুতর হল, হ'ল অন্তরতর। সেই বোধ অতি ধীরে তাঁর রচনায় এক মায়াময় আস্তরণ বিছিয়ে দিল,আপন অজানিতেই তিনি প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে হারালেন। প্রকৃতির ভালোবাসায় যে আছে এক মন কেমন করা অনুভূতি তা গভীর অরণ্যভূমির কাছাকাছি এলেই উপলব্ধি করা যায়। বিভূতিভূষণ প্রকৃতির উদার অসীমাঞ্চলে মুক্তির প্রসঙ্গে 'আরণ্য'কে বলেছিলেন—

'অভিজ্ঞতা না থাকিলে বলিয়া বোঝানো কঠিন
সে মুক্ত জীবনের উল্লাস।'

বুদ্ধদেব গুহ লিখছেন—

"পৃথিবীতে যে এত ভালো লাগা আছে, তা এই রুমাণ্ডি পাহাড়ে এই গোধূলির মেঘে ঢাকা আলোয় উপস্থিত না থাকলে জানতাম না। প্রকৃতিকে ভালোবাসার মতো ব্যথানীল অনুভূতি যে আর নেই, তা জানতাম না"

(কোয়েলের কাছে)

বেদনভরা এই মধুর অনুভূতিই জড়িয়ে থাকে বুদ্ধদেবের প্রেমানুভবেও। এভাবেই প্রকৃতিকে তিনি মনোপ্রকৃতির সঙ্গেও মিশিয়ে দেন। বহু সমালোচক তাঁর লেখার মধ্যে দেখতে পান রোম্যান্টিকতার আতিশয্য, আবেগের অতিরেক। আসলে একবিংশ শতকে পা রাখা অতি আধুনিক মানুষও কিন্তু মনে মনে নিজস্ব নির্জনে থেকে যায় রোম্যান্টিক, এখনো চারটি অক্ষরের অতি পুরোনো 'ভালোবাসা' শব্দটি বৈজ্ঞানিক মনেও ঘনিয়ে আনে সম্মোহনের ইন্দ্রজাল। বুদ্ধদেব গুহ তাই বিশ্বাস করেন প্রকৃতির জাদুতে, বিশ্বাস করেন প্রেমের মায়ায়। সাহিত্য রচনায় মস্তিষ্কের চেয়ে হৃদয়ের ভূমিকাকেই তিনি বড়ো বলে মনে করেন।

আর সেই হৃদয়ের ছোঁওয়া লেগে তাঁর প্রকৃতি বর্ণনাও হয়ে ওঠে এক মন কেমন করা মোহনিয়া ছবি। বুদ্ধদেব গুহর ভাষা সহজ সরল—নিরাভরণ নগ্ন এক পবিত্রতা যেন ঘিরে থাকে তাঁর প্রকৃতি বর্ণনায় যা অনেক সময়ই হয়ে ওঠে প্রকৃতিবন্দনা—

> 'আকাশে চাঁদ ছিল। আজই বোধহয় পূর্ণিমা। একটি হলুদ থালার মতো চাঁদ পাহাড়ের মাথা বেয়ে পত্রবিরল শালবনের পটভূমিতে গ্রীষ্ম সন্ধ্যায় ধীরে ধীরে আকাশ বেয়ে উঠতে লাগলো। নীল, নীল নীল আকাশে। আর সেই ঘন নীলে তার হলুদ রঙ ঝরে গিয়ে অকলঙ্ক সাদা হল। সমস্ত জঙ্গল পাহাড় হাসতে লাগলো। সেই হাসিতে একটি খেয়ালি হাওয়া ঝুরু ঝুরু করে শুকনো পাতা উড়িয়ে নিয়ে নাচতে লাগলো। (কোয়েলের কাছে)

নিরলঙ্কার প্রায় যুক্তাক্ষরহীন এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে লেখক সৃষ্টি করেন এক প্রকৃতি প্রতিমা, যা তার অকলঙ্ক শুভ্রতার মধ্য দিয়ে ছুঁয়ে যায় পাঠক হৃদয়। সায়ন্তন আকাশের সন্ধ্যাতারাকে বুদ্ধদেব উপমিত করেন 'পান্নার মত সবুজ, কান্নার মত টলটলে', নিবিড় নয়নের নীরব চাহনির সঙ্গে।

প্রকৃতির সঙ্গে নারীমূর্তিকে মিলিয়ে দেওয়া চিরদিনের কবিমনের স্বাভাবিক প্রকাশ। বিহারীলালই বোধহয় প্রথম সচেতনভাবে উচ্চারণ করেছিলেন 'প্রণয় করেছি আমি প্রকৃতি রমণী সনে'।

বুদ্ধদেব গুহ এমন উচ্চকিত ঘোষণা হয়তো করেননি কিন্তু মৃদুস্বরে নিরুচ্চার স্বগত সংলাপ প্রকৃতিকে ভালোবেসেছেন প্রেমে, প্রণয়ে, সখ্যে বেঁধেছেন। তাঁর আপন অগোচরে প্রকৃতি যেন হয়ে উঠেছে তাঁর মানস প্রতিমা।

> "প্রকৃতির মত সুগন্ধি, সুবেশা, সুন্দরী মেয়ে আর দেখলাম না। এই ক্ষণে ক্ষণে শাড়ি বদলানো। এখন শীতের সবুজ গাদোয়াল ছেড়ে বসন্তের ফিকে হলুদ বেগম বাহার পরেছেন। শ্যাম্পু করা শুকনো পাতার চূড়ো বেঁধেছেন। আর আতর, কি আতর। সর্বক্ষণ শরীর অবশ করা গন্ধে হাওয়া ম ম করে।" (কোয়েলের কাছে)

—এই অসাধারণ বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শময় প্রকৃতি যেন অধরা নায়িকার মতোই মোহময়ী। নবীনা নায়িকার শরীরের সুরভির মতো বুদ্ধদেব অনুভব করেন 'বনজ সন্ধ্যার গায়ের নিজস্ব গন্ধ'। আবার কখনো 'সমস্ত বনের শরীর থেকে সদ্য চান করে ওঠা কিশোরীর শরীরের গন্ধর মত' সুবাস খুঁজে পান। ঠিক এমন ভাবেই ওঁর নিজস্ব প্রিয় নারীকে বনজ কুসুমের গন্ধে মিলিয়ে দেন—

"চলতে ফিরতে ওর অজানিতে আমার জন্যে অচেতন ও যা উপচে ফেলে যায়, কোনো সুখী সাঁওতাল ছেলের মত। বৈশাখী সকালের ঝরে পড়া মিষ্টি মহুয়া ফলের মত তা আমি কুড়িয়ে বেড়াই। ও জানে না, কী সুবাস, কী স্বাদ, কী ভালো লাগা ও আমার জন্যে রেখে যায়, যখনি ও কাছে আসে।"

(হলুদ বসন্ত)

এই অস্থির, স্পন্দিত, আবেগ কম্পিত ভালোবাসায় ভয় আছে, সংশয় আছে, বেদনা আছে, বিশ্বাস আছে। আছে আশ্রয়। এই প্রকৃতি যেন বুদ্ধদেবের নিয়তি, তাঁর প্রেম, তাঁর পরিণাম। তাই নিসর্গ প্রকৃতি ওঁর সাহিত্যে কেবল উপাদান নয়, আঙ্গিক নয়, তা একেবারে সামগ্রিক জীবনায়ন। সেজন্যই বিচিত্র বিভায় তা বিচ্ছুরিত। কখনো তা পটভূমিরূপে, কখনো চরিত্র হয়ে, কখনো সমাজকে প্রতীকিত করে, কখনো বা সমগ্র অনুভবে আভাসিত হয়ে পাঠককে পৌঁছে দেয় অন্য ভুবনে, যেখানে বনজ্যোৎস্নায় সবুজ অন্ধকারে ভেসে যেতে যেতে পাঠক শুনতে পায় নৈঃশব্দ্যের গান।

বুদ্ধদেবের এই প্রকৃতিপ্রেম যা আসলে তাঁর অস্তিত্ব লগ্নিত মগ্ন চৈতন্য অনুভব—তা একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব বোধ ও প্রত্যয়। এর মধ্যে অবশ্যই মিশে আছে রোম্যান্টিক স্বপ্নমেদুরতা যা আধুনিক বস্তুতান্ত্রিকতার বিরোধী। তাই কেউ কেউ তাঁকে স্বপ্নসন্ধানী অলসশয়নবিলাসী বলে নিন্দিত করতে চাইলেও তাঁর বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় না। কারণ যারা এখনো হৃদয়ধর্মে বিশ্বাসী, যারা এখনো স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে, যারা এখনো শতবার উচ্চারিত 'ভালোবাসা' শব্দটিকে বহুব্যবহারে মলিন ভাবে না, যাদের কাছে আজও 'প্রেম' দু অক্ষরের জাদুমন্ত্র, তাদের মতো পাঠকের অন্তরে বুদ্ধদেব গুহ বন্দিত ও নন্দিত।

রোম্যান্টিক ঈশ্বর বিশ্বাসী, হৃদয়বান বুদ্ধদেব তাই তাঁর আশঙ্কার কথা আমাদের শোনান—

"মাঝে মাঝে মনে হয়, বিজ্ঞান যে চাঁদকে, মঙ্গলকে বসবার ঘরের মধ্যে এনে দিল, তাতে মানুষের রোম্যান্টিকতা রহস্যপ্রিয়তা, কল্পনা প্রবণতা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাবে না তো? ভয় হয়"

(রাগমালা)

আসলে চিরজীবী, চিরযুবা, চিরসবুজ যে মন, সেখানেই তো জীবনের আনন্দ, রহস্য। সেই অনন্ত রহস্যময়তা আছে অনন্ত যৌবনা প্রকৃতির মধ্যে। আর তাই

বুদ্ধদেব গুহ তাঁর চিরকিশোর মনের সজীব আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বনমর্মরে, নদী নির্ঝরে নিসর্গের অনিঃশেষ গান শুনতে পান।

> "প্রকৃতির প্রেমে যে তেমন করে মজেছে কখনও, কেবল সে-ই জানে এই বোধ কত আন্তরিক, অমোঘ এবং সত্য। দলছুট দুষ্টু ছেলের মত সে কেবলই অন্যের হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে চলে আসতে চাইবে জঙ্গলে বারবার। এ নেশা দুর্মর এই কারণে যে এই অবৈধ পরকীয়া প্রেম গৃহীকে সন্ন্যাসীতে রূপান্তরিত করে।"
>
> (মহুলসুখার চিঠি)

তাঁর প্রকৃতিমগ্নতার প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব সশ্রদ্ধ স্মরণ করেছেন তাঁর বাবাকে যিনি ছেলেবেলা থেকে তাঁর বড়োছেলেকে বনে জঙ্গলে রোদ-চাঁদ বৃষ্টিতে অভিষিক্ত করেছিলেন, দিয়েছিলেন আরণ্যক দীক্ষা। তাঁর কথা ভেবেই লেখক বহু জায়গায় উদ্ধৃত করেছেন এক চিরস্মৃত উক্তি, যা প্রকৃতপক্ষে একটি স্প্যানিশ গানের কলি। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময়ে কয়েকজন বিদ্রোহীকে শেষরাতের ক্যাম্পফায়ার ঘিরে এই গানটি গাইতে শুনেছিলেন বুদ্ধদেবের প্রিয় লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। প্রফেসর কার্লোস বেকারের লেখা হেমিংওয়ের জীবনীর মধ্যে এই গানটি খুঁজে পেয়েছেন বুদ্ধদেব গুহ,যা মিলে গেছে তাঁর জীবনচর্যায়—

"I had an inheritance from my father
It was the moon and the sun
I can travel throughout the world now
The spending of it is never done."

বুদ্ধদেব গুহর বই-এর নামকরণেই মিশে আছে প্রকৃতিময়তা। নগ্ননির্জন, হলুদ বসন্ত, কোয়েলের কাছে, , কোজাগর, শালডুংরি দূরের দুপুর, ভোরের আগে, সন্ধ্যের পরে, মউলির রাত, ঋভুর শ্রাবণ, পাখসাট, ধূলোবালি, লবঙ্গীর জঙ্গলে, জঙ্গলমহল, বনবাসর, জঙ্গলের জার্নাল, মহুলসুখার চিঠি, পলাশতলীর পড়শি, আরণ্য, সাঁঝবেলাতে, পাখিরা জানে, সমুদ্র মেখলা, বনজ্যোৎস্নায় সবুজ অন্ধকারে, কুর্চিবনে গান—বিচিত্র নামের মধ্যে প্রকৃতির রূপ, রং, রস মিশে আছে। এই নামের মধ্যেই যেন নীল অরণ্যের শিহরণ ধরা পড়ে, ডানায় রৌদ্রের গন্ধ মাখা পাখিদের ঘরে ফেরার শব্দ শোনা যায়, জ্যোৎস্নায় ভেসে যাওয়া বনজগন্ধে মন কেমন করে ওঠে। তাই বলে কেবল নামের সাজানো বাগানেই ওঁর লেখনি ঘুরে বেড়ায় না, গভীর গোপন অন্তরমহলে বাসনাকুসুমকেও সে ফুটিয়ে তোলে।